Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-II, published on April 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
E ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানবপ্রেম

দেবলীনা বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল:

Keyword
বাংলা ছোটগল্প, যন্ত্র সভ্যতা, সামাজিক চিত্র, রহস্যময়তা, দাম্পত্য সম্পর্কে

Abstract

ভূমিকা: বিশ্বের চারজন সেরা গল্পকার হিসেবে এডগার অ্যালন পো, মোঁপাসা, অন্তন চেকভ এবং রবীন্দ্রনাথের নাম করা যায়। তেমনই বাংলা ছোটগল্পের লেখক হিসেবে অন্যতম সেরা ছিলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ এবং বুদ্ধদেব বসু। এই সকল বাংলা ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি পৃথক স্থান দখল করেছিলেন, এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকা সঠিক নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে তাঁর বিষয় নির্বাচন, লেখনী শৈলী এবং সর্বপরি প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র আবেদনের অধিকারী।

আমেরিকার গল্প লেখক এডগার অ্যালন পো তাঁর গল্পে শব্দ চয়ন এবং বিষয় বর্ণনা রীতিতে অসাসাধণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফ্রান্সের ছোটগল্পকার মোঁপাসা তাঁর গল্পে তৎকালীন ফ্রান্সের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের নানা চিত্র অঙ্কন করেছেন। মোঁপাসার গল্পচয়ন রীতিও অসামান্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই মোঁপাসার বহু ছোটগল্প বাংলায় অনুবাদ করে নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। রাশিয়ার খ্যাতনামা গল্প লেখক হিসেবে চেকভ সকলের কাছে পরিচিত। চেকভের বিষয় নির্বাচন এবং বিষয়ের গভীরতা তাঁর গল্পকে অন্য লেখকের থেকে আলদা স্থানে জায়গা করে দিয়েছে। বিশ্ব গল্প লেখকদের দরবারে যার কথা না বললে অন্যায় হবে, তিনি হলেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জীবনকে ভালোবেসে, জীবনবোধকে জাগ্রত করে যে সব লেখা তিনি লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল—'পোষ্টমাস্টার', কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা হৈমন্তি' ইত্যাদি গল্প। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় লিখেছেন—

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করে মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

বাংলা ছোটগল্পের এই ধারার সার্থক উত্তরসূরী ছিলেন গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। ওনার লেখা পড়েও অন্তরে আরও অনেক অনুভূতির সাথে তীব্র অতৃপ্তি বা আরও কিছু জানার স্পৃহা জন্ম নেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনী সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়—'প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে থিওরীর বালাই নেই, তিনি শুধু একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

সেই পরিবেশের মধ্যে মনটা যে ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেটাই মনের সঠিক পরিচয়। এই পরিবেশ সৃষ্টিতেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব।' (ছোটগল্প ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবন্ধ সংকলন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দে'জ পাবলিশিং)। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কল্লোল-কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনকে একটা বিদ্রোহের যুগ বলে ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা করাই এই যুগের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা আইডিয়া বা সিম্বল মাত্র। প্রচলিত রাবীন্দ্রিক ধারাকে ভেঙে-চুড়ে এক নতুন দিনের আগমন ধ্বনিত হয়েছিল এই সময়ের লেখকদের সাহিত্যকর্ম জুড়ে। সেই সাহিত্যকর্মে প্রেম, প্রকৃতি, নিসর্গ থাকলেও সব থেকে বেশি স্থান জুড়ে ছিল মানুষ। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের সাহিত্য ভাবনাতে উঠে এসেছিল মানুষের কাহিনি। এই কাহিনি কোনো কল্পলোকের কল্পকথা নয়। সেই কাহিনি ছিল সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের রোজনামচা। মধ্যবিত্ত দাম্পত্য, সেন্টিমেন্ট এবং মানসিকতার দলিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'মানে' কবিতায় লিখেছেন—

'মানুষের মানে চাই
গোটা মানুষের মানে।
রক্ত মাংস হাড় মেদ মজ্জা
ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ কাম হিংসা সমেত
গোটা মানুষের মানে চাই।'

বহুকাল পূর্বে বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই বাণীর সার্থকতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকর্মের পরোতে পরোতে পাওয়া যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে ছিল মেদহীন ঝরঝরে প্রকাশ ভঙ্গি বক্তব্যের ফেনিলতা, ভাব বিহ্বলতা তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে ছিল না। তিনি গল্পের স্বল্প পরিসরে সামান্য বলতেন, কিন্তু পাঠকদের নিয়ে চলে যেতেন এক বিস্তীর্ণ মানবজগতে সেখানে পাঠকের ভাবনা উন্মুক্ত আকশে ডানা মেলতে পারে। "... যাদের কথা কেউ লেখেনা, যারে জীবনের চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথা লেখার একটা তাগিদ" প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনের মধ্যে ছিল বলে তিনি দাবী করেছেন, ('গল্প লেখার গল্প')। এই বিন্দু থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প তথা সাহিত্য পথে যাত্রা শুরু। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'যে আছে মাটির কাছাকাছি।'

রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনার সার্থক ফলাফল হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন গ্রাম ও শহর নির্বিশেষে মানুষের মনের ভেতরে প্রবেশ করে ফ্রয়েডিয় মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করতেন, তেমনই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলতে শহর ও শহরতলির কথা তুলে ধরেছেন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। মানুষকে, মানুষের মনকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে অনেক বেশি করে আগলে রেখেছেন, যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি সংগ্রামি। তাঁর রচনার চরিত্ররা লড়াই করে, পরাজয় স্বীকার করে না। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের চরিত্রগুলি অনেক বেশি সাধারণ, যেন বাস্তবের চরিত্রগুলো ছাপার অক্ষরে উঠে এসেছে, তারা লড়াই করে ভাগ্যদেবীকে বদলাতে পারে, কিন্তু তবুও তারা বাঁচে, স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন সার্থক হয় না, তবু বেঁচে থাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী', 'পুন্নাম', 'সংসার সীমান্তে'—সহ আরও অনেক ছোটগল্পে এই বিষয়টি ধরা পড়ে। এই সাধারণ জীবনশৈলী সাধারণ পাত্রপাত্রীর সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পকে অসাধারণত্বের সীমানায় নিয়ে গিয়েছিল।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'মানে' কবিতার মাধ্যমে যেমন জানিয়েছিলেন যে, তার 'গোটা মানুষের মানে চাই', যে কোনো সৃজনশীল কবি বা সাহিত্যিকের একজন গোটা মানুষের অর্থ বুঝতে চায়, রূপ চিনতে চায়, কোনো প্রকার খণ্ডিত রূপ কারও কাছেই কাম্য নয়। কোনো মানুষের কোনো একটি অংশ জানলে সম্পূর্ণ মানুষটিকে কোনোভাবেই বিচার করা যাবে না। সাদা-কালো, ভালো-মন্দ মিলে একজন মানুষ সম্পূর্ণ হয়। সেখানে মানুষটির শুধু আলোকিত দিকটি দেখব আর অন্ধকার দিকটি উপেক্ষা করব, তাহলে তো দিনের পর রাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। প্রেমেন্দ্র

মিত্র এই অন্ধকার অংশটিকে অস্বীকার করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলন এই সমস্ত ঘটনায় সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে তাই আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বিষয়বস্তু থেকে শহরের নিষিদ্ধ গলির বারবণিতার সংসার তৃষ্ণা—সবটাই সুন্দর ভাবে উঠে এসেছে কোনো রকম উপমা অলংকারের আভরণ না পরেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি।' কিন্তু সব সময়ে সমস্তটা পাওয়া সম্ভব হয় না, তখন মানুষের সমস্তটার প্রতিনিধি স্বরূপ অংশকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হয়। আমরা আসলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য সবটা মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ অবয়ব, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো মানুষের অন্তর-বাহিরের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য সমস্ত শাখার সাথে গঠন প্রণালীতে ছোটগল্প। আলাদা নয় ছোটগল্প লেখার সময় বিষয় বা প্লট, প্রকাশভঙ্গি যেমন উপমা, চিত্রকল্প, ভাষাবিন্যাস, অলংকার ইত্যাদির ওপর জোর দেওয়া হয়। ছোটগল্পের প্রেক্ষিতে ভাববাদী দর্শন, মার্কসবাদী দর্শন, অস্তিবাদী দর্শন তুলে ধরা হয়। আবার পৃথিবীর সেরা ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় প্রত্যেকেই সাহিত্যে মঙ্গলবোধকে জাগ্রত করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের বিচার করতে গেলে সবার প্রথমে বলতে হবে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং গভীরতার কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প লেখা শুরু করেছেন বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, এই সময় অর্থনৈতিকভাবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই সময়ের গল্পগুলির প্রেক্ষাপটে উঠে এসেছে জীবনের ভাঙাচোরা নানা ছবি। প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন মেসে থাকতেন, তখন লুকিয়ে একটি পোষ্টকার্ড পড়ে ফেলেছিলেন, যেখানে কোনো এক গ্রাম্য বধূ লিখেছিলেন—'আর জ্বর হয় না' এই পত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি দুটি গল্প লিখেছিলেন। 'শুধু কেরানী' আর 'গোপনচারিণী'। তাঁর গল্পে ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক সংকট, রোম্যান্টিকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাত্র জীবনে ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী চিন্তা ধারার লেখক। ইংগার সোলের লেখা বই পড়েছেন, বেদ পড়েছেন, উপনিষদ পড়েছেন কখনও কখনও তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার সংকেত পাওয়া গিয়েছে, আবার মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার প্রভাবও লেখনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পগুলি আলোচনা করলে তার মধ্যে অস্তিবাদী চেতনার প্রকাশ পাওয়া যায়। এই অস্তিবাদী চিন্তার প্রভাবেই তিনি ক্যামুর 'The Ontsider' অনুবাদ করেছেন। এই চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যতন প্রধান গল্পগুলিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে অস্তিবাদী দর্শন প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রমাণ—'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'পুন্নাম', 'মহানগর' বা 'স্টোভ' গল্পগুলি। অন্ধকার থেকে আলোর উত্তরণ অস্তিবাদী সাহিত্যের মূল। বলা যায়—'Existentislism is concereed with man's freedom, and because it aims to change is readers, to free them from illusion and to convert them, it foolws that it has always been thought of, with Justice, as a committed and practical Philosophy.' [Existentislism by Mary Wornock, p. 2]

সাহিত্য সমাজের দর্পণ তেমনই প্রতিটি লেখকের দায়িত্ব সাহিত্যের প্রতিটি অংশে সামাজিক চিত্র তুলে ধরার। অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার, অশিক্ষা জনিত অসামাজিক আচরণ সবই প্রগতি সাহিত্যের অঙ্গ। ঠিক এর বিপরীতে হল 'পরগতি' সাহিত্য। এই সমস্তটা হল মানুষের জন্য শিল্প, আবার এর বিরুদ্ধে যাঁরা রয়েছেন তারা বলেন—শিল্পের জন্য শিল্প, আসল কথা বলতে গেলে সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্যই শিল্প সৃষ্টি করা উচিত। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ, সংঘের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় হয় ১৯৩৮ সালে। ডিসেম্বর মাসে ঐ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ একটি লিখিত ভাষণ পাঠান। ওই অধিবেশনে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রগতি লেখক 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে পরিচিত হয়। এই সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় সরাসরি কম্যুনিস্ট লেখক যেমন—মানিক, সুকান্ত, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো উচ্চস্বরে না হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা পরিলক্ষিত হতো। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যের কবিতায় সেই দায়বদ্ধতার চিত্র স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে। তিনি লেখেন—

'হে প্রহরী, হানো অসি নিশার মরমে—
যুগ যুগান্তের এই সঞ্চিত আঁধার কেটে যাক্
বেদনার উষ্ণ রক্তধারে।'

এই কবিতার মধ্যে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা দেখা যায়, তা পরবর্তী সময়ে চোখে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের মধ্যে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথম যে গল্পটির কথা মনে পড়ে সেটি হল—'শুধু কেরানী'। এই গল্পে দেখা যায় খুব সাধারণ দু'জন মানুষের ঘর বাঁধার স্বপ্ন এবং আশাভঙ্গের যন্ত্রণা, তবুও জীবন শাশ্বত, তাই জীবনধারা প্রবহমান। গল্পের সূচনাতেই এক অসাধারণ রূপকল্প—'তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময়। চঞ্চল পাখিগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে।' এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে লেখক জীবনের যে অবিরাম ধারা সতত প্রবহমান তার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। পাখিদের নীড় বাঁধবার মতো কেরানী দম্পতি দু'জন ঘর বেঁধেছিল নিতান্ত সাদামাটা ভাবে। কেরানীর শ্যামলা স্ত্রী সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু সে ছিল মমতাময়ী কেরানীটি রোজ খেয়ে দেয়ে অফিসে যেত, আর মেয়েটি সারাদিন ধরে প্রহর গুণতো, কখন তার স্বামী ঘরে ফিরবে। ছুটির দিনে তারা সাধারণ আনন্দ আলাপ করে সময় কাটায়। নিতান্ত তুচ্ছ কথা যেমন—'মেয়েটি হয়তো জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা মশা মারলে পাপ হয় তো?' আবার কখনও ছেলেটি মেয়েটির খোঁপায় গোড়ের মালা জড়ানোর জন্য অফিস থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরে। এভাবেই নিতান্ত সাধারণভাবে কেটে যাচ্ছিল সাধারণ দু'জন মানুষের রোজনামচা। হঠাৎ শ্যামলা মেয়েটির জ্বর হয়, আর ক্রমে ক্রমে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু উভয়ই নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে থাকে। লেখকের ভাষায়—'তারপর ঘরকন্না পাতবার নব-নব কল্পনার গল্প করে, কেমন করে ছেলে মানুষ করবে, তার কি নাম রাখবে, এইসব।' জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা, নর-নারীর স্বাভাবিক সংসার তৃষ্ণা ধ্বনিত হয় গল্পটির পরোতে পরোতে, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে কেরানী দম্পতির স্বপ্ন সত্যি হয় না। যেমন সত্যি হয়নি অঘোর দাস আর রজনীর স্বপ্ন। 'সংসার সীমান্ত' গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাগ্য বিড়ম্বিত দুইজন নর-নারীর চিত্র এঁকেছেন। দেহ পসারিনী বিগত যৌবনা রজনী খদ্দের খোঁজ করার জন্য রাস্তার পাশে কুপি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই রাত ছিল অবিশ্রান্ত ঝড় ও জলের রাত। হঠাৎ রজনীর ঘরের খদ্দের হয়ে ঢোকে চোর অঘোর দাস। আসলে চুরি করে পালানোর জন্য সে রজনীর আশ্রয় নেয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সে আশ্রয় ভালোবাসায় পরিণত হয়। ঠিক ভালোবাসার কথা স্পষ্ট করে প্রেমেন্দ্র মিত্র কোথাও বলেননি। আসলে এক প্রবল ঘর বাঁধবার ইচ্ছে জেগে ওঠে তাদের মনে। আসলে পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ স্থিতি চায়, চায় একটু থিতু হতে। জীবনস্রোতে বয়ে যেতে যেতে অঘোর দাস আর রজনী চেয়েছিল স্থিতি, চেয়েছিল সংসার করতে। আসলে ক্লেদপঙ্কিল মাটিতেও যে প্রেমের পঙ্কজ ফোটে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায়—'গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে যাহাদের অতীতলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যাহাদের ক্লেদপঙ্কিল, তাহারাও ঘর বাঁধিতে চায়, পৃথিবীর ভাগ্যবান নর-নারীদের জীবন লীলার অনুকরণ করিতে তাহাদেরও সাধ যায়। কিন্তু এখানেও বাদ সাধে নিয়তি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে অঘোর শেষবারের মতো চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যায়, আর রজনী আজীবন সেই আবর্জনাময় পরিবেশে থেকে অঘোরের জন্য প্রতিজ্ঞা করতে থাকে। এই প্রতীজ্ঞা যেন শুধুমাত্র অঘোরে আর রজনীর প্রতীজ্ঞাময় সমস্ত নর-নারীর। কাতর প্রত্যাশা, আন্তরিক প্রতীজ্ঞা, কিন্তু জীবন কখনো নিয়ম মেনে চলে না, তাই তাদের দেখা স্বপ্নগুলো আর সত্যি হল না। আসলে এটাই বাস্তবতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পতে তাই দেখা যায়, মেদহীন ঝরঝরে অবয়ব। অলীক স্বপ্নের মায়া কাজল না পড়িয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলি হয়ে ওঠে অনেক বেশি বাস্তবধর্মী।

নিয়তিবাদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'পুন্নাম' গল্পটি সেই নিয়তিবাদের সার্থক দলিল। নিয়তির সাথে লড়াই করা সহজ নয়, এক কথায় অসম্ভব। তাই এই গল্পে নিয়তির বিরুদ্ধে সোজাসুজি লড়াই করে নয় বরং চুরি, জুয়াচুরি করে নিয়তিকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকার কৌশল বড়ো হয়ে উঠেছে। 'পুন্নাম' গল্পে ললিত-

এর পীড়িত পুত্রকে বাঁচানোর জন্য তাকে নানা ফন্দি করতে হয়। পুত্রকে হাওয়া বদল করার জন্য অন্যত্র নিয়ে যেতে হয়। যেখানে তাদের পরিচয় হয় প্রতিবেশী শিশু টুনুর সাথে। টুনুর পাশে থেকে ললিতের নিজের সন্তানের স্বভাবের কদর্যতা, স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরভাবে চোখে পড়ে। এতদিন তার সন্তান তাকে এবং তার স্ত্রীকে অত্যাচার করত, কিন্তু বাইরে এসে সে প্রতিবেশী শিশু টুনুকে অত্যাচার করতে শুরু করে। ললিত লক্ষ করে তার ছেলের মধ্যে রয়েছে প্রবল ঈর্ষাপরায়ণতা, প্রবল হিংসা দ্বেষ। শেষে দেখা যায়, রোগে ভূগে টুনু মারা যায়, আর নীচমনা খোকা অর্থাৎ ললিতের ছেলে সুস্থ হয়ে ওঠে। ললিতের কণ্ঠে যেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর্তনাদ করে ওঠেন—'টুনু মরে গেল আর আমাদের ছেলে বেঁচে উঠল—আশ্চর্য নয় ছবি? আমাদের ছেলের মত আরো কোটি কোটি ছেলে বাঁচবে, বড় হবে, রেষারেষি মারামারি কাটাকাটি করে পৃথিবীকে সরগরম করে রাখবে; নইলে আমাদের এত চেষ্টা এত কষ্ট স্বীকার যে বৃথা ছবি।' এখানেই জীবনের আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। টুনু এবং খোকা এখানে প্রতীক বা সিম্বল মাত্র। সমাজের দুই ধরনের মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ। সমাজের এক শ্রেণি চিরকাল শোষিত হতে হতে মিলিয়ে যায়, আর অন্য শ্রেণি বুক চিতিয়ে বেঁচে থাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পটি তাঁর অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। এই গল্পটিতে আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দারিদ্র্যজাত মননক্রিয়ার কথা লেখা আছে। গল্পের কথন ভঙ্গিটিও আলাদা। 'অসুখ আর কিছুতেই সারে না' দিয়ে গল্পটি শুরু, যেন মনে হয়—কত আগের থেকে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ তার অসুখের কথা জানতে পারলাম আমরা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের প্রকাশভঙ্গিও স্বতন্ত্র। 'পুন্নাম' গল্পে শিশুটির চোখ বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছেন—'শিশুর চোখ সে নয়—জীবনের সমস্ত বিরল বিস্বাদ পাত্রে চুমুক দিয়ে তিক্ত মুখে কোন বৃদ্ধ যেন সে চোখকে আশ্রয় করেছে। শুধু এই অসহায় কাতরটুকু শিশুর।'

গল্প লেখার ও গল্প বলার মধ্যে যে মুন্সীয়ানা দরকার তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে পুরো মাত্রায় ছিল। 'হয়তো' গল্পটির সূচনাতেই গল্পের পরিণতি বলে দেওয়া হয়েছে। তবুও সমস্ত গল্প জুড়ে থাকে ঘনঘোর রহস্যময়তা আর টানটান উত্তেজনা। 'হয়তো' গল্পটির সূত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'নানা রঙে বোনা' স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন যে, ঢাকা যাওয়ার পথে সূত্রাপুট থেকে গ্যান্তেরিয়ার পথে তিনি একটি অসমাপ্ত সেতু পার হয়েছিলেন। সেই স্মৃতি থেকেই তাঁর এই 'হয়তো' গল্পের বয়ন, সেই সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন।

'হয়তো' গল্পের মধ্যে যে রহস্যময়তা, মানব মনের গহীন গোপন অন্ধকারে যে সকল না বলা কথা থাকে তা লুকিয়ে আছে। ফ্রয়েড মানব মনের লিবিড়ো বা অবচেতন মনের কথা বলেছিলেন। আমাদের চেতন মন এবং অচেতন মনের অতিরিক্ত আর একটি মহল অবচেতন মন। আমাদের মনের নানা অবদমিত ইচ্ছে, পাওয়া না পাওয়া স্থান করে নেয় অবচেতন মনের অন্দরে। সেই মনের আলো-আঁধারী মিশে আছে গল্পটির পরোতে পরোতে flash back রীতিতে গল্প শুরু হয়। প্রথমেই চোখে পড়ে ক্ষয়ে যাওয়া সাত মহলা বাড়ি। নোনা ধরা ইঁট, পুরনো কাঠের পাঁজরে অশরীরা যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে আসে লাবণ্য। স্বামী ছাড়া লাবণ্যের সংসারে রয়েছে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা এবং লাবণ্যের পিসিশাশুড়ি। সেই পিসি-শাশুড়িকে দেখে লাবণ্য প্রথমে শিউরে উঠেছিল, কারণ 'শকুনির মতো শীর্ণ বীভৎস মুখের কানা একটি চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি দিয়া মূর্তিমতী জরা যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের 'নীশিথে', 'কঙ্কাল', 'দুরাশা' গল্পের মতো গা ছমছমে রহস্য ঘিরে আছে কিন্তু এখানে কোনো ভৌতিক ঘটনার কথা নেই, তবে প্রকাশভঙ্গি অনেকটা অলৌকিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'হয়তো' গল্পের কিছুটা বোঝা যায়, আর কিছুটা যেন দুর্ভেদ্য পর্দার মতো বেষ্টিত হয়ে থাকে। গল্পে লাবণ্যর স্বামী মহিম কখনো তাকে ভালোবেসে বুকে জড়িয়ে নেয়, আবার কখনো তার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মত্তের মতো ব্যবহার করে। অন্যদিকে সুন্দরী মাধুরীর ব্যবহারও তাকে অবাক করেছিল। এমন অবস্থায় একদিন মহিম তাকে বলে সে মুক্তি চায়, সে নতুন করে বাঁচতে চায়, মহিমের করুণ আর্তি—'তুমি জাননা লাবণ্য, বাধা, রক্তের ভেতর কতো বিষ জমে আছে। কিন্তু এ বিষ থেকে অমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালোবাসা পাই'। মহিম লাবণ্যকে নিয়ে ঝড় জলের রাতে নিরুদ্দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে,

আসলে সে বের হয় নবজন্মের আশায়। এরপর দেখা যায়, পোল পার হওয়ার সময় মহিম লাবণ্যকে নীচে ঠেলে দেয় কিন্তু রেলিং এ কাপড় আটকে থাকে এবং পথচারী লেখকের সহায়তায় সে জীবন ফিরে পায়।

অস্তিবাদী দর্শনের তিনটি স্তর, যথাক্রমে—অনুভূতি স্তর, নৈতিক স্তর এবং ধর্মীয় স্তর। অনুভূতি স্তরে সাময়িক স্খলন ঘটলে নৈতিক স্তর এবং ধর্মীয় স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মহিম, মাধুরী মেয়েটির প্রতি আসক্ত ছিল এবং তার পদস্খলন ঘটেছিল। সেই কারণে, তার মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হয়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প বাস্তবের মাটিকে আশ্রয় করে রচিত হয়, তাই তাঁর গল্পে বাস্তবধর্মীতা কোথাও লঙ্ঘিত হয় না। আমাদের বাস্তব সমাজে এমন অনেক অসুস্থ মানসিক বিকৃতিসহ মহিমের মতো মানুষ বাস করে, আমাদের আশেপাশের সেই মানুষগুলোর প্রতিনিধি রূপে মহিমকে অঙ্কন করেছেন লেখক।

নারী-পুরুষের সাংসারিক সম্পর্কের রসায়ন সবসময় প্রেমেন্দ্র মিত্রের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। একদিকে নর-নারীর প্রেম এবং অন্যদিকে নারী-পুরুষের সংসার তৃষ্ণা। 'শৃঙ্খল' গল্পটিতে দেখা যায় ভূপতি এবং বিনতির দাম্পত্য সম্পর্কের সাতকাহন। আসলে 'শৃঙ্খল' গল্পের মাধ্যমে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ আসলে সামাজিক জীব, তাই সমস্ত অসুবিধা, অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একবার যদি দুটি প্রাণ দাম্পত্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়, তবে তা ছিন্ন করা শুধু কঠিন নয় একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন দুটি মানুষের মাঝে থাকে অদৃশ্য প্রাচীর, শুধুমাত্র সহাবস্থান। এই গল্পটি পড়ে আমাদের মনে বিস্ময় জাগে যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র মানসিকভাবে কতটা আধুনিক ছিলেন। আমরা বর্তমান সমাজে দেখি, দাম্পত্য সম্পর্কে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তেমনই ভূপতি ও বিনতি সহাবস্থানে ছিল সমঝোতা করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে বিনতি, সে উপার্জনক্ষম সুপুরুষ ভূপিতিকে বিবাহ করে। কিন্তু ফুলসজ্জার রাত থেকেই ভূপতির মধ্যে বিকৃত মানসিকতার ইঙ্গিত পায়। এরপর ধীরে ধীরে ভূপতির অস্বাভাবিকতা বিনতির কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিনতি সন্তান সম্ভবা হলে, আগত সন্তানের কথা ভেবে সে ভয় পায়, তখন সে মৃত্যু কামনা করতে শুরু করে। এরপর দেখা যায় যে, বিনতি মৃত সন্তান প্রসব করে বাড়ি ফিরে আসে। কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ ভূপতি বিনতিকে নিয়ে বায়োস্কোপ দেখতে যায় এবং বিনতিকে রেখে বাড়ি ফিসে আসে। কিন্তু বিনতি একাই বাড়ি ফিরে আসে। তখন ভূপতি বলেছিল—'না সবই ভেবেছিলাম। মনের ঘেন্নায় তুমি নাও ফিরতে পার, সেইটের ওপর জোর দিয়ে ভুল করেছিলাম।' বিনতি সংসারের শৃঙ্খল কাটাতে পারেনি জন্য ফিরে এসেছিল, কিন্তু সেই ফিরে আসার মধ্যে কোনো ভালাবাসা ছিল না। একই ছাদের নিচে, একই ঘরে, এক বিছানায় এমন শত শত নর-নারী বাস করে যারা সংসার তৃষ্ণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু ভালোবাসার পাত্রটি শূন্য হয়ে পড়ে থাকে। ভূপতি ছিল বিকৃত মানসিকতার অধিকারী আর একই সাথে সন্দেহ পরায়ণ, এই চরিত্রটির সাথে 'হয়তো' গল্পের মহিমের মানসিকতা তুলনা করা যায়। মহিমও ছিল ভূপতির মতো সন্দেহবাতিক এবং বিকৃত মানসিকতার অধিকারী, যেই মানসিকতা তাদের দাম্পত্য জীবনে বিষময় করে তোলে। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন ছিলেন ছোটগল্প লেখক, তেমনই তিনি ছিলেন একজন কবি। তিনি তার 'দেবতার জন্ম হল' কবিতায় লিখেছেন—

'আজ বিকৃত ক্ষুধার ফাদে বন্দী মোর ভগবান,
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর,
আর কাঁদে পাতকীর বুকে
ভগবান প্রেমের কাঙাল!'

মানুষের জীবনে ক্ষুধা বিচিত্রভাবে দেখা দেয়। কখনো তা পেটের ক্ষুধা রূপে আবার কখনো শরীরের ক্ষুধা রূপে, আবার মনের ক্ষুধাকেও অস্বীকার করা যায় না। এই গল্পে একজন দেহপসারীনি বেগুনের ক্ষুধার কথা তুলে ধরা হয়েছে। তারাশঙ্করের 'বেদেনী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে যেমন 'perverted sex' এর কথা বলা হয়েছে, তেমনই এই গল্পটিতেও বেগুনের সম্মান রক্ষার তাগিদ, পেট চালানোর তাগিদ চোখে পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এর

আগেও 'সংসার-সীমান্ত' গল্পে দেহপসারিনী রজনীর কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে ছিল বিগত যৌবনা রজনীর সংসার তৃষ্ণা। শরীরের খিদের থেকে সেখানে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় সংসার করার খিদে। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পে বেগুন খদ্দের ধরার জন্য রাতের অন্ধকারে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তা হয়তো তথাকথিত সুখি শিক্ষিত মানুষের চোখে লজ্জার উদ্রেক ঘটায় কিন্তু দেহপসারিনীদের জীবনে এটাই একমাত্র বাস্তব। লেখক অপূর্ব ভাষায় বেগুনের খদ্দের জোগাড় করার ব্যর্থতাকে প্রকাশ করেছেন—'অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলের সঙ্গে দূরের ব্যাণ্ডের অপরিস্ফুট সুর ধারার মাধুর্য ও সমস্ত আনন্দ সমারোহের উপর অতল গভীর আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্রখচিত রহস্যাবরণ সমস্তই বেগুনের কুটিল পথক্লান্ত জীবনের নিত্য অবহেলার মরচেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।' এই ব্যর্থতার হাহাকার পাঠকের চোখেও জল আনে। বেগুনের খদ্দের ধরার প্রচেষ্টাকে তাই vulgar sex বলে দেখা যায় না, মনের কোনো কোথায় যেন সহানুভূতির উদ্রেক ঘটায়। 'মহানগর' গল্পটিতেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নাগরিক সভ্যতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠেছে মহানগর কলকাতা। কলকাতার অন্ধকার গলির অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে 'মহানগর' গল্পের প্রতিটি অংশে। শিশু রতন এবং তার দিদি চপলা মহানগরের অনেক বাস্তব চরিত্রের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। রতনের দিদি মহানাগরিক স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, রতন মনস্থির করে এসেছে দিদিকে সে খুঁজে বের করবেই। নৌকা পোনাঘাটে পৌঁছানোর পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লে রতন উল্টোডিঙ্গির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, পথে দিদি বলে একটি মেয়েকে ভুল করে পড়ে সেই মেয়েটির মাধ্যমেই রতন দিদি চপলাকে খুঁজে পায়। চপলা ও তার ভাই-এর অশ্রুসিক্ত মিলন হয়, যদিও এই মিলন ক্ষণস্থায়ী, চপলা রতনকে জানায় যে, তার ফিরে যাওয়া অসম্ভব, যেমনটা জানিয়েছিল সংসার-সীমান্তের রজনী অঘোর দাসকে। আসলে সমাজের নিষিদ্ধপল্লীতে একবার প্রবেশ করলে, সেখান থেকে মুক্তির পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, রতন যতই প্রতিজ্ঞা করুক যে—'বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি, কারুর কথা শুনব না।' যন্ত্রসভ্যতার আধুনিকতার বিষাক্ত গড়ল আমাদের সমাজের এই সকল নারীদের পান করতে হয়েছে। বেশিরভাগ সময়ই অভাবের তাড়নায় পরিস্থিতির শিক্ষার হয়ে নারীদের পতিতা হতে হয়েছে। এই সকল পতিতা নারীদের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহানুভূতি লক্ষ করা যায়। এই সহানুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায়—'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'সংসার সীমান্তে', 'লজ্জা', 'সাগর সঙ্গম' গল্পে। দেহপসারিনীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর একটি কবিতায়—

'জন্মলব হয়ত সে
কোন উর্মি ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে।
কিংবা কোন জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে।
দীন্ কোন্ পথের নটীর কোলে।'

(ফিরে আসি যদি প্রথমা)

সমাজের যারা পতিত, যারা অবহেলিত তাদের প্রতি তীব্র সমবেদনা আসলে তীব্র মানব প্রেমের সার্থক প্রতিফলন। 'সাগর সঙ্গম' গল্পে দেখা যায়, মানব প্রেমের ও মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। সাগর স্নান করার উদ্দেশ্যে মুখার্জি পরিবারের বিধবা বড়ো বউ নৌকা করে সঙ্গমে যাত্রা করছিল, সেই নৌকায় অনেক লোকের সাথে যাত্রী হিসেবে কয়েকজন বারবণিতা উপস্থিত ছিল। এমন অবস্থায় হঠাৎ একটি মহাজনী নৌকা এসে পড়ায় যাত্রী বোঝাই নৌকা উল্টে গেল। চারিদিকে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল। হঠাৎ দাক্ষীয়ণী দেখতে পায় যে, বেশ্যাদের একরত্তি মেয়ে বাতাসী নৌকার হাল ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। দাক্ষায়ণী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে রক্ষা করে। সকলের ধারণা হয় বাতাসী দাক্ষায়ণীর মেয়ে, কিন্তু দাক্ষায়ণী বার বার তা অস্বীকার করে। এরপর ঘটনাক্রমে বাতাসীর জ্বরে আক্রান্ত হওয়া, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং অবশেষে বাতাসীর মৃত্যু। এই দীর্ঘ পথ চলতে গিয়ে ধীরে ধীরে দাক্ষায়ণীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে যায়। দাক্ষায়ণী যেই বেশ্যা কন্যাকে ঘৃণা করত, গল্পের শেষে এসে সেই বেশ্যা কন্যা বাতাসীর মা হয়ে ওঠে। এখানেই মানবতার সার্থকতা, এখানেই মানুষের উত্তরণ। সার্থক হয়ে ওঠে কবির বাণী—

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনেক ছোটগল্পের শিল্প সমুদ্রে ডুব দিয়ে কিছু নির্বাচিত ছোটগল্প আলোচনা করে হয়তো বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করা গেল। মানবপ্রেম এবং পতিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতি এই গল্পগুলির প্রধান বিষয়বস্তু। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যখন মনুষ্যত্ব ধুলিধূসরিত, নাগরিক সভ্যতার বিষবাষ্পে মানুষ যখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটসম ম্রিয়মাণ, তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে মানবপ্রেম এবং সমাজের অবহেলিত শ্রেণিকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর গল্প বুঝতে গেলে মানুষকে বুঝতে হবে। প্রলয় বিধাতা, কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন—

'প্রলয়ের আগমনী জানতে,
মানুষের চোখের দিকে তাকাও,
তোমার পাশে যারা আছে তাদের
নিত্য দুবেলা যাদের দেখছ, তাদেরও।
আকাশ সমুদ্র কি পৃথিবীর বুকে নয়।
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে—
কালান্তরের ভয়ঙ্কর ভূমিকা
রচিত হচ্ছে মানুষেরই মনের গহণে।'

সহায়ক গ্রন্থ:

১. মুখবন্ধ, সমস্ত গল্প (প্রথম খণ্ড), প্রেমেন্দ্র মিত্র, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৮৯।
২. প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্প, (সম্পাদনা) সৌরিন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।
৩. গল্পের ভুবন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ড. রামরঞ্জন রায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা।
৪. কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের এক'শ বিশ বছর/১৮৯১-২০১০, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫. ছোটগল্পের সুলুক সন্ধান, তপোধীর ভট্টাচার্য।